http://www.elearninginfo.in

বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী ভাবনা

বাংলা সাহিত্যে নারীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নারীবাদ বলতে কি বোঝায় তারও একটু আলোচনার প্রয়োজন। এই বিষয় নিয়ে বাংলায় লেখালেখি খুব একটা হয় নি। অনেকের মতে তার কারণ নারীবাদ বিষয়টাই একেবারে বিদেশী, পাশ্চাত্যের রপ্তানি। এ নিয়ে যা আলাপ আলোচনা আজকাল হচ্ছে, তা আমাদের নিজেদের কথা নয়। বিদেশী চিন্তাধারা জোর করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; বাঙালীর মুখে বিলিতি বুলি মানায় না। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করাই উচিত।

নারীবাদ যে পুরোপুরি পাশ্চাত্যের সৃষ্টি তা মেনে নিতে আমার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। বাঙালী সমাজে পুরুষ প্রাধান্য, নারী নির্যাতন, ইত্যাদি নিয়ে সেই আদ্যিকাল থেকে বহু সাহিত্য রচনা হয়েছে। পত্রপত্রিকায় অনেকে লিখেছেন, এ নিয়ে সমালোচনাও করেছেন। ফুল্লরার বারমাস্যা তো নারীর সামাজিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। কালীঘাট পটে এলোকেশী হত্যার ঘটনা রঙ তুলিতে আঁকা হয়েছে বহুদিন আগেই। অর্থাৎ সমাজে নারীর সীমিত অধিকার, অমর্যাদা, ও অত্যাচার সম্বন্ধে সচেতনতা বাঙালী মনসে অনেক দিন থেকেই রয়েছে।

ধরে নিলাম একেবারে বিদেশী আমদানি না হলেও নারী সম্পর্কিত চিন্তা বাঙালী সমাজে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে - ইংরেজ মেমের চলাফেরার আপাত স্বাধীনতার সঙ্গে বাঙালী মধ্যবিত্ত রমণীর আচার ভীরুতা আর পুরুষ-নির্ভরতার তুলনা থেকে। তারও বেশ কিছু পরে, গত শতাব্দীর ষাট দশকের ইউরোপীয় ও মার্কিন নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কেন্দ্রিক আলোচনা তৃতীয় বিশ্বে যখন সোচ্চার হয়ে উঠল বাংলায়ও তার প্রতিধ্বনি উঠেছে। অর্থাৎ মেনে নিচ্ছি বাঙালী নারীবাদী চিন্তায় পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ছাপ থাকলেই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অপবাদ দিয়ে যদি সব কিছু বর্জন করার দাবী ওঠে, তাহলে তো বঙ্কিমচন্দ্রের অর্ধেক লেখা, প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীত, কম্পিউটার বনাম নানান কারিগরি বিদ্যা, ডাক্তারি শাস্ত্র, ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের ত্যাগ করতে হয়।

তবে নারীবাদী চিন্তাধারার অস্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে স্বীকার করে নিলেও এর সংজ্ঞা নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। চিন্তাধারা হিসেবে নারীবাদ কি এক এবং সার্বজনীন? দেশ কাল পাত্র ভেদের ভিত্তিতে সেটা অবশ্য ঠিক মানা যায় না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক কাল, এ সবই

নারীবাদের সংজ্ঞা রচনা করতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের নারীবাদ কৃষ্ণাঙ্গদের নারীবাদী দর্শনের থেকে যথেষ্ট পৃথক। ঠিক সেই রকম, তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ প্রথম বিশ্বের মহিলাদের চিন্তাধারার থেকে কিছুটা দূরে সরে থাকবে তা বলা বাহুল্য। এই তফাৎ মেনে নিলেও সব দেশের নারীবাদের মধ্যে কতগুলো সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এই মিলগুলি থেকে আমরা একটা সার্বজনীন সংজ্ঞা গড়ে তুলতে পারি। নারীবাদের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নারীকে স্থাপন করা। নারীবাদীদের দাবী যে সমাজে কোন বিতর্ক, গঠন, সৃষ্টি, বা গবেষণা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। সমাজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রশ্ন করতে হবে মহিলাদের জীবনে তা কি ধরণের প্রভাব ফেলবে।

তার মানে কি নারীবাদীরা আজকের পুরুষ প্রধান সমাজের বদলে ভবিষ্যতে রমণী প্রাধান্য গড়ে তুলতে চান? তা কিন্তু নয়। নারীবাদীদের মতে পৃথিবীর প্রতি সমাজে, প্রতি শ্রেণীতেই সব দিক থেকে মহিলারা এত পিছিয়ে, এত অধিকার চ্যুত হয়ে আছেন যে তাঁদের দিকে আপাতত: বিশেষ মনোযোগ না দিলে চলবে না। আগামী কোন এক সুদিনে পুরুষ-নারীর অবস্থা সমপর্যায়ভুক্ত হলে দুগোষ্ঠীর প্রতি এক ব্যবহার করতে পারব। এবং তা ঘটবে যখন মহিলা পুরুষ দুজনকেই আমরা শুধু মানুষ হিসেবে চিনতে শিখব।

তাহলে নারীবাদের লক্ষ্য হল গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে সমাজের কেন্দ্রে বা সামাজিক বৃত্তের মাঝখানে নিয়ে আসা। তবে এ শুধু আকাশ কুসুম কল্পনা হলে চলবে না। নারীবাদীদের আকাঙক্ষা অনেক। আন্দোলনকারীদের মতে এই পরিবর্তনের জন্যে আমাদের সক্রিয় হতে হবে, লড়তে হবে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে সাত মহলার স্বপ্ন দেখা চলবে না, মহল গড়ে তুলতে সবাইকে হাত মিলিয়ে খাটতে হবে। আর এখানেই হল গোলমাল। নারীর সমান অধিকার সম্পর্কে বিশ্বাসী অনেকেই। বিশেষত: আজকের সমাজ সচেতনতার যুগে কে আর ভাবে (অথবা মুখ ফুটে বলতে চায়) নারী পুরুষের দাস। কিন্তু তা নিয়ে আন্দোলন, শ্রম, সংগ্রাম? তাতে শরিক হতে চায় কজন?

নারীবাদীদের মতে এই দায়বদ্ধতাটুকু না থাকলে কাউকে ঠিক নারীবাদী বলা চলে না। নারীবাদের অঙ্গীকার গ্রহণের সঙ্গে চলতি সমাজব্যবস্থা উৎখাতের দায়িত্বও স্বীকার করে নিতে হবে। যে সমাজ গড়ে উঠেছে পিতৃতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিতে, সেখানে নারীর সমান অধিকার স্থাপন করার েৈদজল দুরাশা মাত্র। বর্তমান সমাজব্যবস্থা নাকচ করতে পারলে তবেই সেখানে সমানাধিকারের জায়গা হবে। শুধুমাত্র সমাজ সংশোধনে ব্রতী হলে সমানাধিকারের প্রস্তাব অলীক হতে বাধ্য।

এই যদি নারীবাদের সংজ্ঞা হয় তাহলে বাংলায় নারীবাদী সাহিত্য আদৌ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। বাংলায় নারী কেন্দ্রিক গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনা হয়েছে বহুদিন থেকেই। পুরুষ বৃক্ষে জড়িয়ে ওঠা লতা হিসেবে নয়, স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিময় নারীমূর্তি আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮২), আর দেবী চৌধুরানীতে (১৮৮৪)। এ সব উপন্যাসে স্বাধীন, সক্রিয়, সবলা রমণী চরিত্র আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, স্তিমিত লাজুক, স্বকীয়তা বিহীন নারীত্বের বিকল্প হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। মুস্কিল হল বঙ্কিমের ভাবকন্যারা যতই স্বাধীনচেতা হন না কেন, স্বামী সন্দর্শনে তাঁরা একেবারেই কাবু হয়ে পড়েন। মেয়েদের জীবনে যে স্বামী এবং সংসারই সব, বঙ্কিমের রচনায় তা বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ মেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে সমাজ পরিবর্তন, এমনকি সমাজ সংশোধনেও বঙ্কিমের খুব একটা উত্সাহ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর গল্পের নায়িকারা নিপীড়িত বঙ্গললনার শুধু এক রকমফের।

অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেই আমরা প্রথম নারীবাদের অঙ্কুর দেখতে পাই। তাঁর চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬-১৯৩৭) শৌর্যেz বিক্রমে পুরুষের সমকক্ষ। সে পুরুষালী বিদ্যায় শিক্ষিত, এমনকি পুরুষের বেশে সজ্জিত। আজকের যুগ হলে চিত্রাঙ্গদাকে নির্দ্বিধায় ক্রস ড্রেসার বলা যেত। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা (১৯৪০-১৯৪১) নারীর পক্ষে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই করেছে। ভালবাসার পাত্র শুধু বেছে নেওয়াই নয়, তাকে নিজের করে পেতে যেন তেন প্রকারেণ সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাও শেষ পর্যন্ত

চিত্রাঙ্গদাকে তার প্রেমিকের কাছে সহকর্মিনী হবার অনুমতি চাইতে হয়: যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সঙ্কটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে। আর শ্যামার আগ্রাসী প্রেমের পরিণতি হয়েছে ধ্বংসে। তার চেয়ে বড় কথা, এই দুই নারী চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্য মেয়েদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাননি বা চাননি বলেই মনে হয়। তাই এরা নহে দেবী নহে সামান্যা নারী - অনন্যা; সাধারণ মহিলাদের নাগালের বাইরে। শ্যামা চিত্রাঙ্গদার উত্তরণের সঙ্গে বাকী দশজন মেয়ের অবস্থা জড়িয়ে ফেলেন নি রবীন্দ্রনাথ।

অন্যান্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ নারীর সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন কিনা সে হিসেব এখানে করা অসম্ভব। তবে তাঁর দুটি ছোট গল্পের উল্লেখ না করলে এই সমীক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। জীবিত ও মৃত (১৮৯৩-১৮৯৪) গল্পে কাদম্বিনী বিধবা এবং এক অদ্ভুত ঘটনার পাকে পড়ে সকলের কাছে মৃত। বস্তুত: গল্পের শেষে তাকে মরে প্রমাণ করতে হল যে সে মরে নি। নারী, বিশেষত: স্বামীসম্বল হীন বিধবার অস্তিত্ব যে কি ভাবে সমাজের প্রান্তদেশে সরিয়ে রাখা হয়েছে তারই উদাহরণ কাদম্বিনীর জীবন। কাদম্বিনীর কাতরোক্তি - কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই, ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব - এই বক্তব্য মানবিক অধিকার চ্যুত প্রত্যেক বাঙালী নারীর কান্না। পুরুষের পরিচয় বিহীন তার স্থান যে ইহলোক পরলোক কোথাও নেই, সে কথা বাংলার মেয়েদের অজানা নয়। কাদম্বিনীও শেষ অবধি মরতে বাধ্য হয়। জেতার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ তাকে দেন নি।

তবে এর বিকল্প আমরা পাই স্ত্রীর পত্রে (১৯১৮-১৯১৯)। মৃণাল ঘরের বৌ হলে কি হবে সে বুদ্ধি ধরে, কবিতা লেখে, এবং সন্তান হীন। তার প্রথম সন্তান - যে সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল - সে ছিল এক কন্যা। এহেন মৃণাল যার সংসারে খুব বেশী দাবী থাকার কথা নয়, সে নিজের ব্যক্তিত্বের দাপটে দাঁড়াবার কিছুটা মাটি কেড়ে নিয়েছিল, এবং সেখানে ঠাঁই দিয়েছিল আর একটি দুঃখী মেয়েকে। এই বিন্দুর দৌলতেই মৃণাল সমাজে মেয়েদের অবহেলার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে। সেখানেই ঘটে তার জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন, যার ফলে সে স্বামী এবং বাড়ী, দুইই ত্যাগ করে। মৃণালের জবানীতে আমরা বারবার শুনি মেয়ে জাতের বাধা মেনে চলতে হবে, বা মেয়েদের জীবন (আমাদের) কিই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? অথবা চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামী জিনিষের (পুরুষ) পরেই তার লোভ।

স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রতি মৃণালের ঘৃণার মূল কারণ নারীজাতি, বিশেষ করে বিন্দুর প্রতি তাদের ক্রুরতারÝরতার ঘটা দেখে। সমকামিতার ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথ এখানে দিয়েছেন। মৃণালের প্রতি বিন্দুর ভালোবাসার রূপ - বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে।- প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধাহীন পুরুষ শাসিত সংসারে ভালোবাসার পরশ পেতে নিজেদেরই জড়িয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে নারী - রবীন্দ্রনাথ একে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন। বিন্দু মারা যাবার পরে মৃণাল নিজের ইচ্ছেয় স্বামী পরিত্যাগ করে, স্বাধীনতা চায়, তার সুপ্ত নিজস্বতাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়। গল্পের শেষ পঙক্তিতে সে উল্লেখ করে আর এক সংসার ত্যাগী নারী, মীরা বাঈয়ের নাম। নিজ উদ্দেশ্য সাধনে মীরার অদম্য জেদ মৃণালকে উদ্বুদ্ধ করে। যদি কোথাও, এই একটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ নারীবাদী হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, শ্রেণী ও লিঙ্গ বৈষম্যের ছেদবিন্দুতে অবস্থিত নারীর অধিকার চ্যুতির মাত্রা সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নারীবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের নাম করবো না, তা হয় না। তবে শরৎচন্দ্রের কোন একটি বিশেষ উপন্যাসের নাম করার প্রয়োজনও দেখি না। শরৎচন্দ্রই বোধহয় একমাত্র লেখক, যিনি বাঙালী সমাজের অবক্ষয় দেখাতে নিয়ম করে নারীর সামাজিক পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন। তাঁর মানস কন্যারা সমাজের নানান স্তর থেকে এসেছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হিসেবে তিনি উপস্থিত করেছেন নিম্নমধ্য ও মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের। এই মাঝের তলায় বাইরের ঠাটবাট, আচার আচরণ এবং পুরুষ প্রাধান্যের আপাত শৃঙ্খলালা টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত বলি হয় মেয়েরা। শরৎচন্দ্রের

লেখায় এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী সুস্পষ্ট। কিন্তু তা বলে শরৎবাবু সমাজের প্রতি পুরোপুরি জেহাদ ঘোষণা করেন নি। শুধু কিছু ক্ষমতা লোভী অনুশাসকের বিকৃতির প্রতিবাদ করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন যৌথ পরিবার, বিবাহ, ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথাগুলিকে। এ সবের মধ্যে নারী নির্যাতনের বীজ তিনি দেখতে পান নি।

এই পর্যন্ত যে সব লেখকের উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়াও নারীর সামাজিক অবস্থা নিয়ে লিখেছেন আরও অনেকে। ঐতিহাসিক সূত্র দেখলে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে কল্লোল যুগ অবধি নারী কেন্দ্রিক যত রচনাই হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকদের নারীর অপাংক্তেয় অবস্থা সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা। এর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল সমাজ সংস্কার। ফলে এই সব লেখায় স্থান পেয়েছে উচ্চ, ও কমপক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা এবং তাদের জীবন বৃত্তান্ত। অনেক লেখকই জোর দিয়েছেন পুরুষ শাসনের ফলে নারীর মানসিক নির্যাতন ও ক্ষয়ের ওপর। ষাট দশক অবধি বাংলা সাহিত্যে এই হাওয়াই বয়েছে।

এর মধ্যে এক বিশেষ ব্যতিক্রম বাঙালী শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার ১৯০৫ সালে লেখা চটী উপন্যাস সুলতানাস ড্রীম আজ ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ফেমিনিস্ট ইউটোপিয়ান উপন্যাস হিসেবে আদৃত। বাংলায় লেখা নয় বলে সুলতানাস ড্রীম দেশী সাহিত্যে কেÅ পায় নি। কিন্তু এক বাঙালী বৌয়ের লেখা বইটি নারীবাদের যেকোনো মাপকাঠিতেই শীর্ষস্থান পাওয়ার যোগ্য। এতে নারী পুরুষের কর্ম আর ধর্ম পাল্টাপাল্টি করে রোকেয়া চলতি সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গড়েছেন, কারোর সহানুভূতির অপেক্ষায় বসে থাকেন নি। নারীর পূর্ণ মুক্তির জন্যে যে এক নতুন জগতের প্রয়োজন তা বেগম রোকেয়া এক কল্পরাজ্য সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে তিনি সত্যিই এক বিশিষ্ট অগ্রদূত।

এছাড়া বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী রচনার মধ্যে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ট্রিলজি, প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৫), সুবর্ণলতা (১৯৬৭), ও বকুল কথা (১৯৭৪)। মোটামুটি ভাবে আশাপূর্ণা দেবীর সব লেখাই নারী কেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত মহিলাদের জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী এবং সেই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ নিয়ে তাঁর বেশীর ভাগ গল্প। তা বলে আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিটি লেখাকে নারীবাদী বলা চলে না। এ সবের মধ্যে চলতি সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার সেরকম ইঙ্গিত আমরা কোথাও পাই না। তবে প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণলতা একেবারেই দলছুট। এই দুটি উপন্যাসে, বিশেষত প্রথম প্রতিশ্রুতিতে আশাপূর্ণা দেবী সত্যিকারের নারীবাদী হয়ে উঠেছেন। পুরুষ শাসনের প্রতি তাঁর ক্রোধ এবং ধিক্কার অসহায় বা নিরুচ্চারিত নয়। সত্যবতীর মাধ্যমে এই সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো, বিবাহ প্রথা ও নারী পুরুষের সম্পর্ক, তিনি অবলীলায় অস্বীকার করেছেন। আবার সুবর্ণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই প্রত্যাখ্যানের পথ কতটা জটিল হতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে নারীকে বেঁধে রেখেছে। এই যুদ্ধে জিততে হলে সাহস এবং কৌশল দুইই চাই। কিন্তু আশ্চর্যz, বকুল কথাতে গিয়ে এই লেখিকাই রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন। আধুনিক নারীর মধ্যে সামাজিক অধিকার জিতে নেবার পরে শুধু উছৃঙ্খলতাই দেখেছেন।

এ বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনার কথা না বলে পারছি না। আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের শেষ ভাগে তাঁর সাক্ষাৎকার নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময় বকুল কথা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন বকুল কথা লেখার সময়ে নারী প্রগতি নিয়ে তাঁর যা চিন্তাধারা ছিল তার থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। সেই সময়ে আশাপূর্ণা দেবী মনে করেছিলেন নারী মুক্তির সবটুকুই বোধহয় মেয়েদের পাওয়া হয়ে গেছে। ফলে পরের প্রজন্মের সঙ্গে পূর্বসূরির স্বাভাবিক মতান্তরকে তিনি স্বাধীন নারীর ঔদ্ধত্য বলে মনে করেছিলেন। সেই ধারণা আশাপূর্ণা দেবী পাল্টেছিলেন - স্বীকার করেছিলেন যে মেয়েদের পূর্ণ মুক্তি হতে এখনও বহু দেরী।

ষাটের দশক পেরিয়ে সত্তরে পৌঁছে নারীকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন এলো। এ পর্যন্ত সাহিত্যের জগতে ঘোরাফেরা করেছে মধ্যবিত্ত মেয়েরা; গল্প উপন্যাস গড়ে উঠেছে তাদের মানসিক টানাপড়েন নিয়ে। এবারে আনাগোনা আরম্ভ হল শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম, ও দারিদ্রসীমার বাইরে

দাঁড়ানো মহিলাদের। এবারে শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, দৈনন্দিন খাওয়া পরা, রাজনৈতিক নির্যাতন, বেঁচে থাকার তাগিদ নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠল। এই নতুন প্রবণতার সূচনা হয়েছিল আগেই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বুড়ি, ১৯৬৩; নিচু চোখে একটি মেয়েলী সমস্যা, ১৯৬৩) ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (ডাইনী, ১৯৭৩) কিছু ভিন্নধর্মী রচনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবে মহাশ্বেতা দেবীর হাতে এই জাতের গল্প যেন প্রাণ পেল। তাঁর গল্পে আমরা পাই পুলিশী অত্যাচারে নিহত নকশাল সন্তানের ফুরিয়ে যাওয়া মাকে (হাজার চুরাশীর মা), দোপদি মেঝেনকে (দ্রৌপদী), ধনীর ছেলের স্বাস্থ্যের খাতিরে বুকের দুধ বিক্রি করে বেঁচে থাকা যশোদাকে (স্তন্যদায়িনী)। এদের জীবনের মধ্যে দিয়ে সার্বজনীন নারীবাদের জটিলতা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। নারীর অধিকার বিচ্যুতির মাত্রা যে কখনই একরকম হতে পারে না তিনি তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। রাজনীতি, শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ, বঞ্চনার সব যুক্তিই যখন এক বিন্দুতে গিয়ে মেলে তখন সেই অধিকার চ্যুতির রূপ হয় ভয়ঙ্কর। মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরসূরি হয়ে এক ঝাঁক নতুন গোষ্ঠীর লেখক একই বক্তব্য নিয়ে আমাদের কাছে ফিরেফিরে এসেছেন। তাই এই সর্বহারাদের কথাই আধুনিক নারী কেন্দ্রিক সাহিত্যে আমরা বারবার পাই। সব শ্রেণীর মেয়েরাই যে পিতৃতান্ত্রিকতার বলি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নারীবাদী লেখকেরা মনে করিয়ে দেন যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলারা ভিন্ন ভাবে পুরুষ শাসনের শিকার হন। এবং সুযোগ পেলে উঁচু তলার শোষিত মহিলারাই তাদের চেয়ে নিচু তলার মেয়েদের শোষণে হাসিমুখে অংশগ্রহণ করে।

সত্তরের দশকের পরে নারীবাদী লেখা এবং ধ্যান ধারণা বাংলা সাহিত্যে অনেক বেশী মাথা চাড়া দিয়েছে। তসলিমা নাসরিনের রচনা পুরোপুরিই নারীবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। নির্বাচিত কলাম এবং তাঁর অন্যান্য লেখায় তসলিমা তীব্র স্বরে সমাজে নারী অবহেলার কৈফিয়ত চেয়েছেন, নারীবাদের জয়গান গেয়েছেন। এছাড়া বেগম সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন, দেবারতি মিত্র, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয়া মিত্র, এমন অনেকেই এখন তাঁদের লেখায় নারীবাদ আনছেন। সকলেই যে আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লিখছেন তাও নয়। যেমন মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর উপন্যাস সীতায়নে মহাকাব্য রামায়ণকে নতুন আলোকে উপস্থিত করেছেন। এখানে রামায়ণের মুখ্য চরিত্র রাম নয়, সীতা। এক মাতৃতান্ত্রিক সাম্য সমাজকে অগ্রাসী আর্য রাষ্ট্রতন্ত্র কেমন করে পুরুষ শাসনের কব্জায় নিয়ে এল তারই গল্প সীতায়ন।

এবার বলি একালের রচনার কথা। সম্পাদক পূরবী বসু এবং শফি আহমেদ একটি সঙ্কলনে বাংলাদেশের প্রবীণ থেকে নবীন, নানা বয়সের লেখিকার এক গুচ্ছ নারীবাদী ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। এর অনেকগুলিই সাহিত্যের চেয়ে রাজনৈতিক জবানীর প্রতি বেশী মনোযোগী। দরিদ্র নারী আর সমাজের বৃত্তচ্যুত সংসার ঘিরে এই নারীবাদী লেখিকারা তাঁদের গল্পের জাল বুনেছেন। সেলিনা হাসান (মতিজানের মেয়েরা), নয়ন রহমান (বীরপুরুষ), রাবেয়া খাতুন (নাগমোতির হাটে), ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (সূর্য তৃষিতা) মধ্য বা উচ্চবিত্ত সমাজের ধার ঘেঁষেন নি। তাঁদের নায়িকারা বাড়ির ঝি, গ্রামের বৌ, বিক্রিত কন্যা। এঁদের অনেকেই নারী-শরীরের সরিকত্ব নিয়েও সচেতনতা আনতে চেয়েছেন। - আমার শরীর আমার কাছে, অন্যের কি বলার আছে। - কখনও আবার তাঁরা রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন নিজেদের বক্তব্য তীক্ষ্ণ ভাবে পেশ করতে। রূপময়ীর ছয়টি হাত গল্পে শাহনাজ মুন্নী নারীকে স্বামী-পিতার সস্নেহ আশ্রয় থেকে সরিয়ে স্বাধীনতার কঠোরতার মধ্যে নিয়ে গেছেন। রূপময়ী ছয়টি হাতের চারটি (স্বামী ও পিতার প্রতীক) হারিয়ে দুটি মাত্র হাত (নিজের) ধরে রাখতে পেরেছে। এতে তার শক্তি খর্ব হয়েছে কিনা জানি না, তবে সুস্থতা বেড়েছে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মেয়েদের সামাজিক অবস্থার ছবি আঁকাই নয়, এই লেখক গোষ্ঠী তার প্রতিবাদ করছেন আর সেই সঙ্গে পুরুষ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উত্সাহ জোগাচ্ছেন। ক্রমশ এই ধরণের লেখা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

এত সব নারীবাদী রচনা থাকা সত্বেও মনে হয় আজকের বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী সচেতনতা লিঙ্গ সচেতনতার চেয়ে অনেক বেশী প্রখর। শ্রেণী বৈষম্য নাকচ করতে সাহিত্যিকেরা যত সহজে সমাজ

ভাঙ্গার ডাক দেন, নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বেলাতে তার তুলনীয় আগ্রহ যেন দেখতে পাই না। তার মানে এই নয় যে নারীবাদী সাহিত্য গড়ে তুলতে হলে সবার একমত হতে হবে বা একটি সরল সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ তৈরি করতে হবে। কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের সঙ্গে লিঙ্গ প্রভেদের সংগ্রাম পাশাপাশি না চালালে সত্যিকারের নারী মুক্তির সম্ভাবনা অল্প। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অনেক বেশী জটিল, কষ্টকর। প্রথমটি বাইরের লড়াই, অন্যটি গৃহযুদ্ধ।

আরেকটি অভিযোগ বাংলা নারীবাদী সাহিত্যিকদের দরবারে আমার রয়েছে। আজকের সমাজের প্রবহমান ঘটনাবলীর ছায়া তাঁদের লেখায় খুব কমই প্রতিফলিত হতে দেখি। দেশে বধূহত্যার ধূম, মহিলা সমাজকর্মীদের গণধর্ষণ, ধর্মের নামে মেয়েদের আরও অধিকার বিচ্যুতি, অভিবাসী পুরুষের দেশে ফিরে সম্বন্ধ করে বিয়ে এবং স্ত্রী ফেলে পালানো, পরিবারের মধ্যে শিশু কন্যা এবং অন্য মেয়েদের ওপর যৌন অত্যাচার, রাজনৈতিক দলগুলি থেকে মহিলাকর্মী বিতাড়ন, এ সব ঘটনা কারোর লেখাতেই খোলাখুলি ভাবে আজও পাই নি। তাই মনে হয় বাংলার অনেক সাহিত্যিকই নারীবাদ নিয়ে লিখছেন বটে, কিন্তু তাঁরা এখনও নারীবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি।